স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ভাষণ : একটি পর্যালোচনা

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

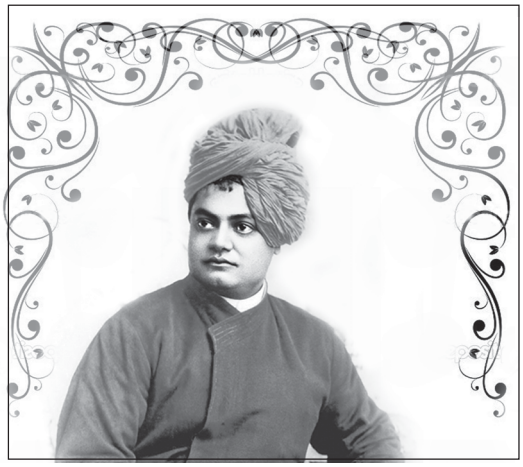

১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার শিকাগো শহরে যে-বিশ্বধর্মমহাসভা আহূত হয়েছিল, তাতে অনাহূত হয়ে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দই উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তা অনেকেই শ্রম ও ক্লেশের বিনিময়ে। সে-কাহিনি আজ আর কারও অজানা নেই। অথচ ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যাত্রার কিছু পূর্বেই গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে স্বামীজী জানিয়েছিলেন, তাঁর জন্যই ওই মহাসভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সেকথা যে কতখানি সত্য প্রমাণিত হয়েছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মহাসভায় যোগদানের কোনও আমন্ত্রণপত্র না পেয়ে, সম্পূর্ণ অপরিচিত অবস্থায় সেই বিদেশ বিভুঁইয়ের মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার যে-মনোবল, তা তিনি অবশ্যই পেয়েছিলেন স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মৌন আশ্বাসের মাধ্যমে, যা সমর্থিত হয়েছিল শ্রীমা সারদা দেবীর অনুমোদনপত্রে।

মনে করা যেতে পারে, ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত স্বামীজীর ভারতভূমি পরিভ্রমণ ছিল ওই পাদপীঠে উপস্থিত হওয়ার প্রস্তুতিপর্ব, যার দ্বারা তিনি নিজ দেশ, জাতি, তার ধর্মচেতনা, সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করে ঋদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, এবং বিদেশিদের দরবারে নিজ দেশ ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা লাভ করেছিলেন।

১৮৬৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম খাস উত্তর কলকাতার সেই অঞ্চলে যেখানে তৎকালীন 'cream of the society' বাস করত। তিনি বাল্যকাল থেকেই সেখানকার পরিবেশ, পরিস্থিতি, সমাজের রীতিনীতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, যেটি ওই বয়সের পক্ষে অভাবনীয়ই ছিল। তাঁর মেধা, মননশীলতা, দয়াপ্রবণতা ও নির্ভীকতার বহু নজিরই ওই বয়সের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে দেখা গিয়েছিল। পিতার বৈঠকখানায় ভিন্ন বর্ণ ও জাতির জন্য সংরক্ষিত পৃথক পৃথক হুঁকো মুখ দিয়ে টেনে দেখার ঘটনাটি যে শুধু বালসুলভ খেলা ছিল না, তা পিতার কৌতূহলী প্রশ্নে তাঁর উত্তরটিতেই—''দেখছি জাত না মানলে কি হয়''—প্রমাণিত হয়েছে। এই উত্তরের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের জাতি-বর্ণ-

ধর্ম-বিভেদ নিয়ে নরেন্দ্রনাথের মনের প্রতিক্রিয়া ও তার সমাধানের ইঙ্গিতের আভাস পাওয়া যায়। তাঁর সংবেদনশীল ও বিবেকী মন তাঁকে বয়সের তুলনায় অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে। তাঁর পড়াশোনা কলকাতার স্কুলে, যেখানে ভারতের দুরবস্থা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, পরাধীনতার যন্ত্রণা সম্বন্ধে আলোচনা শুনতে পেতেন, ওই বিষয়ে নানা সভাসমিতিও হতে দেখেছেন। যেমন ১৮৫৭ সালের যে-সিপাহি বিদ্রোহ ভারতের মানুষদের স্বাধীনতাস্পৃহাকে অনেকটাই উসকে দিয়েছিল, সে-বিদ্রোহের আগুনের তাপ তাঁর ইতিহাসসচেতন কিশোর মনকে উদ্দীপ্ত করেছিল নিশ্চয়ই। সুতরাং ধরে নিতে বাধা নেই যে, তাঁর মনে নিজ মাতৃভূমি সম্বন্ধে, তার দুর্গতি, পরাধীনতার বন্ধন সম্বন্ধে চেতনা গড়ে উঠেছিল অল্প বয়সেই।

দেখা গেছে ১৮৫৭ সালের পর থেকেই ভারতের সাহিত্য, সমাজ ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এক নতুন ধারণার সঞ্চার হচ্ছে, যাকে স্বাদেশিকতার ভাব বলা যেতে পারে। সেইসময় বলতে গেলে স্বামীজীর পাড়াতেই নবগোপাল মিত্রের আখড়ায় হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রমুখ কবি, সাহিত্যিকদের রচনার মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে এক জনচেতনা, জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে সেইসময় এদেশের মানুষের মধ্য থেকে হিন্দুদের ধর্ম ও ঈশ্বর পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢেউয়ে ডিরোজিওর হাত ধরে ভেসে গেলেও, আবার তাঁরই হাত ধরে আশ্চর্যভাবে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের কিঞ্চিৎ সঞ্চার হয়েছিল। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় ডিরোজিওই প্রথম ভারতজননীকে নিয়ে একটি কবিতা লেখেন, যা সেযুগে প্রায় অকল্পনীয়ই ছিল, এবং আমরাও তাঁর ছাত্রদের উত্তরসূরি হিসাবেই স্বাধীন যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করতে পারি, যিনি পরবর্তী কালে ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিকদের মতে ১৭৫৭ সালে সিরাজউদ্দৌল্লার পতনের পর যে-বিদেশি শাসনের সূত্রপাত হয়, ১৮৫৭ সালের পর সেই শাসনের উচ্ছেদের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে যায়। সমস্ত দেশ জুড়েই বলতে গেলে স্বাদেশিকতার বাতাবরণ তৈরি হতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তেজনাপূর্ণ বাগ্মিতার মাধ্যমে কলকাতার সামাজিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সূচনা লক্ষ করা যায়। এই কালেই নরেন্দ্রনাথ দত্ত বড় হয়ে উঠছেন কলকাতার এক সচ্ছল শিক্ষিত পরিবারে। তাঁর নিজস্ব বুদ্ধি, মেধা, শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তা, সমকালীন ঘটনা পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা, দেশ জাতি সম্বন্ধে তাঁকে অনেকখানিই তৎপর করে রাখে।

কিন্তু কলেজজীবনে তাঁর মনের গতি ও পরিণতি দেখা যাচ্ছে ধর্ম ও ঈশ্বরের দিকে। তাঁর মধ্যে তখন ঈশ্বরদর্শনের জন্য এক তীব্র ব্যাকুলতার ভাব জাগ্রত হয় এবং জাগতিক চিন্তাভাবনার বলয় থেকে তাঁকে বার করে ছুটিয়ে নিয়ে যায় ঈশ্বরসাধকদের সন্নিধানে। ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের আওতা থেকে বেরিয়ে তিনি উপস্থিত হন ধ্যানী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদপ্রান্তে একটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আশায়—ঈশ্বরকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন কি না! পরে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আশ্রয়ে এসে শান্তিলাভ করেন—যদিও তাঁকে এর জন্য অনেক সংশয়ের সেতু অতিক্রম করতে হয়েছিল, বলা যেতে পারে অনেক 'trials and errors'-এর মধ্য দিয়ে। এখানে পরিষ্কারভাবে ধরা যাচ্ছে যে তখন অন্যান্য সব চিন্তাকে ছাপিয়ে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে ধর্মভাবটিই predominant হয়েছে। সমকালীন অন্যান্য শিক্ষিত মননশীল ব্যক্তিরা সমাজনীতি, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, কলকাতার পল্লিতে পল্লিতে ওই বিষয়ক সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে

স্বাদেশিকতার রঙে রঞ্জিত হয়ে, কিন্তু সেসব নরেন্দ্রনাথের মনকে আকৃষ্ট করছে না, অথচ তাঁর আবেগপ্রবণ মনকে তা সহজেই নাড়া দিতে পারত। শ্রীম (মাস্টারমশাই) বলেছেন, তিনি তখন সুরেন্দ্রনাথের 'fiery speech' শুনতে প্রবল আগ্রহী হয়ে বিভিন্ন সভায় হাজির থাকতেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের মন তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য সংস্পর্শে একমুখী হয়ে ভগবৎসন্নিধানে ধাবিত হয়ে চলেছে।

কিন্তু 'কিম্ আশ্চর্যম্ অতঃপরম্'! যে-ঈশ্বরদর্শনকারী ঈশ্বরকল্প মানুষটির শরণাপন্ন হলেন নরেন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষিত সমাধিলাভের আশায়, তিনিই তাঁকে জগন্মাতার কাজের জন্য, তাঁর সৃষ্ট জগতের সেবা করার দায় তাঁর ওপর চাপিয়ে দিয়ে, তাঁর সমাধিপ্রবণ মনটিকে বলা যেতে পারে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, জীবজগতের কল্যাণকর্মে জোর করে ঘুরিয়ে দিলেন। তাই এতদিন যে-মনের কেন্দ্রে ছিল ঈশ্বর, সেখানে এসে অধিষ্ঠিত হল জগতের কল্যাণচিন্তা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহাবসানের পর স্বামীজীর দীর্ঘ ভারতভ্রমণের উদ্দেশ্যই ছিল দেশের গণসম্পদ, তার ধর্ম, সভ্যতা, সমাজ, সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ। প্রকৃত ধর্ম বা অধ্যাত্মজ্ঞান তিনি শ্রীগুরুর পদতলে বসেই আয়ত্ত করেছিলেন। তবে ভারত যে পুণ্যভূমি, ভারতে ধর্মই যে প্রধান সম্পদ, তা আমজনতার সঙ্গে মিশে আরও ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করলেন। যদি সেদিন রামকৃষ্ণদেব তাঁকে সমাধির আনন্দ লাভের জন্য হিমালয়ের গিরিগুহায় পাঠাতেন, বা অন্যভাবে বলা যায়—যদি তাঁকে ওই ভগবৎসান্নিধ্যলাভের আনন্দ থেকে সরিয়ে জগতের দুঃখ-যন্ত্রণার দিকে তাঁর মনটিকে ঘুরিয়ে না দিতেন, তবে বোধ হয় তিনি দেশবাসীর অপরিসীম দুর্গতি, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, পরাধীনতার বেদনা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারতেন না এবং তাদের পরিত্রাণের আশায় পাশ্চাত্যে গমনের কথাও ভাবতেন না। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'Patriot Prophet' গ্রন্থের ভূমিকায় পাই, পরবর্তী কালে স্বামীজী সিস্টার ক্রিস্টিনকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "I had the idea of forming a combination of Indian princes for the overthrow of the foreign yoke. For that reason, from Himalayas to Cape Comorin, I have tramped all over the country."

কন্যাকুমারী তীর্থে দেবী কুমারীকে প্রণাম জানিয়ে দেবীর পদচিহ্নশোভিত শিলার সামনে বসে স্বামীজী যে-গভীর ধ্যানে রাত্রিযাপন করেছিলেন, তার তাৎপর্য ছিল অতি গভীর ও সুদূরপ্রসারিত। সেই রাতে তাঁর ধ্যেয় ছিল না কোনও দেবদেবী বা তাঁর গুরু, ছিল ভারতবর্ষ—অখণ্ড ভারতবর্ষ; ধর্মে কর্মে গৌরবময় তার স্বর্ণোজ্জ্বল অতীত; সঙ্গে ছিল দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতাক্লিষ্ট, তিমিরাচ্ছন্ন পরপদানত বর্তমান, আর তার থেকে উঠে আসা অধিকতর উজ্জ্বল ও গরিমাময় স্বপ্নের ভবিষ্যৎ ভারত। স্বামী গম্ভীরানন্দজীর ভাষায় : ''সেই নির্জন দ্বীপে ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর হৃদয়ে জাগরূক রহিল একটিমাত্র চিন্তা—ভারত ও ভারতের ভাগ্যবিধাতার অভিপ্রায়।" কী আশ্চর্যভাবেই না ধ্যানের বিষয় পরিবর্তিত হয়ে গেল এই বৈরাগ্যবান সন্ন্যাসীর হৃদয়ে! ঈশ্বরপ্রণিধান বা আত্মমুক্তি নয়, তার স্থান গ্রহণ করল স্বদেশ ও স্বজাতির মুক্তিচিন্তা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সম্পূর্ণ credit দিতেই হয় এই পটপরিবর্তনের জন্য। গম্ভীরানন্দজী আরও লিখেছেন, স্বামীজী ভাবতে লাগলেন দেশের এই দুর্গতির পরিস্থিতিতে কীরূপ ব্রত তাঁর পক্ষে গ্রহণীয় হতে পারে এবং সে-ব্রত কেমন করে উদ্‌যাপিত হবে। সেই চিন্তা তাঁকে এক আমূল সংস্কারক, সুমহান সংগঠক ও শক্তিমান আত্মানুভবসম্পন্ন

'দেশনায়কে' রূপান্তরিত করে দিল। এখানে দেখছি তাঁর চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-উল্লেখিত 'জগন্মাতা' ও 'দেশমাতৃকা' যেন একাকার হয়ে গেলেন।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'Patriot Prophet' গ্রন্থে এমন একটি সংশয়াত্মক ভাব প্রকাশ করেছেন যে, যদি রামকৃষ্ণদেব তাঁর ঐশীশক্তি প্রয়োগে নরেন্দ্রনাথকে ধর্মের দিকে আকর্ষণ না করতেন, তবে তিনি নিশ্চিতভাবে একজন সুমহান বিপ্লবী হতেন ও ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিতেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই ভাবনাটির সপক্ষে ইতিহাসের সমর্থন মিলবে না কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের যৌবনের ঈশ্বরানুরক্তির তীব্রতা বা ব্যাকুলতাকে কিছুটা তৃপ্ত করে, তাঁকে দেশের দশের কাজেই আত্মনিয়োগে বাধ্য করেছিলেন শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ অনুসরণে, তা না হলে কন্যাকুমারীর শিলাসনে আত্মধ্যান না করে ভারতের দুর্দশামুক্তির চিন্তা তিনি করতেন না। পরবর্তীতে সেই গুরুর কৃপায় ও সমর্থনেই তিনি সাগর পেরিয়ে বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে অতিশয় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অসাধারণ দক্ষতায় ভারতের ধর্মসংস্কৃতির জয়গান করে তাদের মুগ্ধ করে বিশ্বের দরবারে ভারতকে তুলে ধরলেন তার দারিদ্র্য, অশিক্ষা সহই, তার কারণ হিসাবে ইংরেজদের শোষণকেই দায়ী করে। মনে করে নিতে বাধা নেই যে সেদিন ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের দিকে প্রথম পদক্ষেপটি ছিল তাঁরই।

স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রজ্যাকালে দুটি বিষয় লক্ষ করেছিলেন। এক, প্রগাঢ় আধ্যাত্মিকতাবলেই ভারত একদিন সমাজগঠনে, সংস্কৃতিতে ও শিক্ষায় যে-অভ্যুদয় লাভ করেছিল, যে-উন্নত সভ্যতার নজির রেখেছিল, সেই প্রকৃত ধর্মানুভূতি থেকে সরে আসার ফলেই তার অবনতি শুরু হয়েছে। এর কারণ হিসাবে তিনি priest craft বা পুরোহিত অনুশাসনকেই দায়ী করেছেন, যা শুধু বহিরঙ্গের আচার অনুষ্ঠানকে প্রাধান্য দিয়ে, জাতিধর্মের বিভেদ ঘটিয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে মানুষকে সরিয়ে প্রকৃত ধর্মকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। আর দুই, ভারতের বৃহত্তর জনসাধারণের লৌকিক শিক্ষাহীনতা ও দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে বিদেশিরা ও তাদের অনুগৃহীত এদেশের কিছু রাজন্যবর্গ ও জমিদারশ্রেণির ব্যক্তি তাদের শিক্ষিত ও অর্থবান করার পরিবর্তে আরও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের দাসে পরিণত করে ভারতের অকল্যাণ সাধন করেছিল। মাতৃভূমির এই দুঃখময় চিত্রটি স্বামীজীর চোখে ধরা পড়ে এবং তিনি তাই পুরোহিত ও পরাধীনতা এই দুটিকে নির্মূল করতে সচেষ্ট হন। তিনি মনে করেছিলেন তার জন্য ব্যাবহারিক বা কর্মে পরিণত বেদান্তের মাধ্যমে প্রকৃত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার করতে হবে এবং সেইসঙ্গে বিদেশ থেকে আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা গ্রহণ করে এদেশের দরিদ্র জনগণকে শিক্ষিত করে তাদের হৃত ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে দিতে হবে। তবেই ভারতের ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি সম্ভব।

স্বামীজী বুঝেছিলেন আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার সঙ্গে অবশ্যই প্রয়োজন রাজনৈতিক স্বাধীনতা। বলা যেতে পারে তিনি শিকাগো বিশ্বসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন এই স্থির ধারণাটি নিয়ে যে ভারতের অত্যুচ্চ, উদার অধ্যাত্মসম্পদ, তার সর্বজনীন বেদান্ততত্ত্ব সম্বন্ধে বিদেশের জ্ঞানীগুণীজনদের অবহিত করাতে হবে এবং তাদের শিক্ষা ও অর্থসাহায্যে দেশের ঐহিক উন্নতি সাধন করে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভারতের এই পুনরুজ্জীবনই সেদিন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল, যার প্রধান অন্তরায় হিসাবে গণ্য করেছিলেন অবশ্যই বিদেশি শাসন, পরাধীনতার শৃঙ্খলকে। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে গিয়ে যেন তাঁর ধ্যান, তপস্যা, নির্বিকল্প সমাধি, আত্মমুক্তির চিন্তা পর্যন্ত তুচ্ছ হয়ে

গিয়েছিল। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের ধারণায় ওই মহাসভা যেহেতু ধর্মের নামে আহূত হয়েছিল, বিবেকানন্দ সেখানে হিন্দুধর্মের, বেদান্তের সারতত্ত্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদেশিদের কাছে ভারতের ধর্মের মহনীয়তা প্রমাণ করে তার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে তাদের উদ্দীপিত করা, তাদের সমর্থন আদায় করা। স্বামীজীর চিন্তায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই ছিল ভারতের জনগণের উন্নতির একমাত্র উপায়। তিনি এও হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন ভিখারির মতো আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করা যাবে না, তার জন্য উপযুক্ত শক্তিসামর্থ্য, মেধা, যুক্তিবুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাসের প্রয়োগ চাই। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভারতে আত্মধর্ম, আত্মশক্তির যে-অনুশীলন অতীতে হয়েছে, যার নিদর্শন রয়েছে আমাদের বেদ উপনিষদ পুরাণগুলিতে, সেই মহান ধর্মকে অবলম্বন করে, তার ওপর নির্ভর করেই অগ্রসর হতে হবে। কারণ ভারতের এটিই চিরস্থায়ী অমূল্য সম্পদ, যার তুল্য সম্পদ পাশ্চাত্যের নেই। তাকে যথাযথভাবে সেখানে তুলে ধরে তাদের কাছে আদরণীয় ও গ্রহণীয় করে তুলতে পারলে তবেই তাদের চোখে আমরা সম্মাননীয় হব ও স্বাধীনতার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারবে। স্বদেশের ক্ষেত্রেও তিনি দুটি নতুন পথের কথা আমাদের শুনিয়ে সচেতন করতে চেয়েছেন—manmaking education ও manmaking religion।

স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদাই 'ভারত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যদিও আমাদের ধর্মের ব্যাখ্যায় 'হিন্দু' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন কারণ সেটিই অধিক পরিচিত ছিল। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, 'হিন্দু' শব্দের দ্বারা কোনও ধর্মীয় গোষ্ঠীকে বোঝায় না। আমাদের ধর্ম বেদান্ত; বেদ উপনিষদই আমাদের ধর্মশাস্ত্র। সেখানে কোথাও 'হিন্দু' শব্দটি উচ্চারিত হয়নি। প্রখ্যাত লেখক ও প্রাবন্ধিক রামচন্দ্র গুহ স্বামী বিবেকানন্দকে চিহ্নিত করেছেন ইতিহাসে একজন 'Hindu revivalist' রূপে। কিন্তু একথা বললে স্বামীজীর প্রতি অবিচার করা হয়। ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ যখন মঞ্চে হিন্দুধর্মের আলোচনা শুরু করেন, তখন তা ছিল এই ধর্মের সাধারণ ব্যাখ্যা কিন্তু তিনি যখন ভাষণ শেষ করলেন, তখন "Hindu religion was created." কোনও প্রচলিত হিন্দু মতবাদ বা 'ism'কে নিজের ধর্ম বলে প্রচার করেননি তিনি। উপনিষদুক্ত সত্যধর্মের সর্বজনীন সত্যের প্রচার করতেই চেয়েছেন, যা সব দেশে সব কালে সকলের গ্রহণীয় হতে পারবে, সকলেরই আদর্শ জীবননীতি, সমাজনীতি হতে পারবে। তার মধ্যে থাকবে না কোনও গোঁড়ামি, কুসংস্কার, সংকীর্ণতা। দমন-পীড়নের কোনও স্থান থাকবে না তাতে। এই আকাশের মতো উদার বিশ্বজনীন ধর্মের বার্তা দিয়ে তিনি সেদিন বিদেশিদের হৃদয়ে ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ জাগাতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং একইসঙ্গে অগণিত ভারতবাসীর মনেও এক নব উদ্দীপনার সঞ্চার করে তাদের হৃত মনোবল ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতবাসী যেন এতদিনের হীনম্মন্যতা কাটিয়ে আত্মমর্যাদাবোধে জাগরিত হয়ে, এক স্বাধীন বলিষ্ঠ মনোভাব নিয়ে উঠে দাঁড়াতে চাইল। শ্রীঅরবিন্দের মতে স্বামীজী সেদিন জাতীয় জাগরণ ঘটিয়ে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিলেন।

শিকাগো সভায় প্রথম দিনের ভাষণেই স্বামীজী সগৌরবে জানিয়ে দিয়েছিলেন, ভারত চিরদিনই শান্তি ও সহিষ্ণুতার বার্তা দিয়েছে বিশ্বের মানুষকে এবং নিজে কাজেও করে দেখিয়েছে। যখনই পৃথিবীর অন্য কোনও প্রান্তের মানুষ উৎপীড়িত হয়েছে, জাতিদ্বন্দ্ব ও ধর্মবিদ্বেষের শিকার হয়ে ভারতের কাছে আশ্রয়ের সন্ধানে এসেছে, ভারত

কখনই তাদের ফিরিয়ে দিয়ে চিত্তের দীনতা প্রদর্শন করেনি। প্রকারান্তরে স্বামীজী যেন বোঝাতে চেয়েছেন, আজ সেই ভারতকেই ইংরেজদের শাসনাধীন হয়ে থাকতে হচ্ছে। যে-ভারত কখনই কাউকে বর্জন করেনি বা দাবিয়ে রাখেনি, তাকেই আজ সম্পদবান, স্বাধীন ব্রিটিশরাজ হৃতসর্বস্ব করে উপনিবেশে পরিণত করে দাবিয়ে রেখেছে। বিশ্ব ইতিহাস সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের সম্যক্ জ্ঞান, ইংরেজি ভাষায় অসাধারণ দক্ষতা, ভারতের বেদান্ত ধর্ম সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে শ্রোতারা ভাবতে ও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে এমন একজন ব্যক্তি যে-ধর্ম ও জাতির প্রতিনিধিত্ব করছেন, সেই দেশ ও জাতির কাছে ব্রিটিশরা মিশনারি পাঠিয়ে নিজেদের মূর্খতারই পরিচয় দিচ্ছে।

ইতিহাসবিদ অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে শিকাগো সভায় স্বামীজীর ভাষণগুলি ছিল যেন "Counter attack of the East." স্বামীজীর ধারণায় প্রকৃত আত্মশক্তির জাগরণ ব্যতিরেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা যাবে না বা তা পেলেও তাকে ধরে রাখার শক্তি হবে না। তিনি এই শক্তি জাগরণের ক্ষেত্রে শুধু হিন্দু জাতিকে গণ্য করেননি। তাঁর ভারত ছিল হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, পারসি, বৌদ্ধ, জৈন—সকলকে নিয়েই এক মহাভারত। সেই স্বাধীন, সমুজ্জ্বল মহাভারতের উত্থানই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তৎকালে তমসাচ্ছন্ন আমাদের মনে আত্মমর্যাদা, স্বাধিকারবোধ ও জাতীয়তাবোধের যে-জাগরণ ঘটেছিল সেটি ছিল ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের প্রথম পদক্ষেপ—একথা ভাবা নিশ্চয়ই অসংগত নয়। শক্তি ও বীরত্বহীন হয়ে অর্থাৎ দুর্বলতা ও কাপুরুষতা সম্বল করে বীরভোগ্যা স্বাধীনতা কখনও অর্জিত হতে পারে না।

রেভারেন্ড কুক ধর্মমহাসভায় দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলেন (১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩), হিন্দুদের যে-ধর্মগ্রন্থ বেদান্তকে ভারতীয় চিন্তার সর্বোচ্চ পরিণতি বলে মনে করা হচ্ছে, তা ভ্রান্ত ও জীবন সম্বন্ধে নৈরাশ্যবাদী ধারণার ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। প্রসঙ্গত, রাজা রামমোহন রায়ও একদা মনে করতেন, বেদান্ত নৈতিকতা ব্যাখ্যায় অপারগ, তাই তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্মতত্ত্ব বলে মনে করা যাবে না। রেভারেন্ড কুকের পরই স্বামীজীর হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতার নির্দিষ্ট সূচি ছিল। স্বামীজী মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজ বিষয়ে বলার পূর্বে কুকের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, ''আমরা যারা পূর্বদেশ থেকে এসেছি, তাদের প্রায়দিনই শুনতে হচ্ছে যে খ্রিস্টধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সেটিই সকলের গ্রহণ করা উচিত। কারণ এই খ্রিস্টানজাতিই জগতে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। আমরা ভারতবাসী, নিজেদের ইতিহাস জানি। যখন তাকাই বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সম্পদবান স্বাধীন জাতি ইংরেজদের দিকে তখন দেখি তারা কোটি কোটি নিরীহ, দরিদ্র এশিয়াবাসীর (যার মধ্যে ভারতীয়রাও গণ্য) গলায় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সম্পদ লুঠ করে তাদেরকে হৃতসর্বস্ব করে দাবিয়ে রেখেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে—এই ইউরোপীয়রা তাদের বিলাস-বৈভব, সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করেছে তাদের প্রতিবেশী দেশ ও জাতিকে পীড়ন করে, তাদের নিঃস্ব করে। ভারত কোনওদিনই এই সুখসমৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করেনি।''

সেদিন মহাসভায় দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে, সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষ থেকে যে-প্রবল প্রতিবাদী স্বর ধ্বনিত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠে—যে-প্রতিবাদ অবশ্যই ছিল যে-কোনও দেশের ক্ষেত্রেই শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে—তাতে শ্রোতাদের মনে স্বতঃই দরিদ্র, উৎপীড়িত, পরপদানত ভারতের জন্য সহানুভূতির সঞ্চার হয়েছিল। সেই প্রতিবাদী স্বর প্রতিধ্বনিত হয়েছিল সারা বিশ্বে আর সেদিনই তারা প্রত্যক্ষ করেছিল স্বাধীন ভারতের সূর্যোদয়ের আভাস।

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে ভারতের অধিকার

নিয়ে, তার উচ্চ উদার ধর্মের গৌরব নিয়ে বিদেশের মাটিতে কেউই কখনও সোচ্চার হননি। রাজা রামমোহন রায় বা কেশবচন্দ্র সেন—যাঁরা বিদেশে যথেষ্ট সম্মান বা সমাদর পেয়েছিলেন, যাঁরা সহজেই ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে তৎপর হতে পারতেন, তাঁরা কোনও সাবধানবাণী উচ্চারণ করেননি। বলা যেতে পারে স্বামীজীই প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও ভারতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য—যার মধ্যে তার স্বাধীনতালাভও বোঝায়—পরোক্ষে (প্রত্যক্ষভাবে বললেও দোষাবহ হয় না) পাশ্চাত্যের ভূমিতে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর এই স্বদেশপ্রেম, তাঁর দুর্জয় সাহস ও বীরত্বের আঁচ তৎকালীন স্বাধীনতাকামী ভারতের বিপ্লবীদের মনেও তীব্র প্রভাব বিস্তার করে তাঁদের আন্দোলনকে আরও তেজীয়ান ও সুদৃঢ় করেছিল।

গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার ভারতের রাজা পুরুকে পরাজিত করে বন্দি করেছিলেন এবং তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি গ্রিক সম্রাটের কাছে কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করেন। রাজা পুরু উত্তর দেন, ‘‘রাজার প্রতি রাজার ব্যবহার।’’ এই উত্তরটিতেই ধরা পড়েছে ভারতের গৌরবময় সভ্যতা-সংস্কৃতিপুষ্ট স্বাধীন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। পুরুর সেই মর্যাদাপূর্ণ কণ্ঠস্বরই যেন ধ্বনিত হতে শুনলাম স্বামীজীর কণ্ঠে। স্বামীজীও পাশ্চাত্যের মঞ্চে দাঁড়িয়ে পরাধীন জাতির একজন হয়েও আবেদন-নিবেদনে নতশির না হয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্মসম্পদ ও মহান প্রাচীন সভ্যতার কথা ওদের সম্যক্‌ভাবে জানিয়ে, ওদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আমাদের পক্ষে গড়ে তুলে, আমাদের প্রতি ইংরেজদের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেন একটি জনমত গঠন করে দিতে সক্ষম হলেন, যা পরবর্তীতে আমাদের স্বাধীনতালাভে অনেকটাই অনুকূল হয়েছিল। সুতরাং শিকাগোয় তাঁর রাজকীয় উপস্থিতি ও নির্ভীক প্রদীপ্ত ভাষণ অর্ধশতাব্দী পর (১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট) ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য যে প্রাথমিক উদ্যোগ ছিল, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির বিবর্তন ও তার ইতিহাস স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিলেন; অসাধারণ মেধা, স্মৃতিশক্তি তাঁর আজীবন সঙ্গী ছিল। রাজপুত জাতির শৌর্যবীর্য, শিখজাতির ধর্ম ও গুরুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, মারাঠাজাতির বীরত্ব, মুসলিম জাতির ভ্রাতৃত্ব ও একত্ববোধ, ভারতের অগণিত ধর্মপ্রাণ মানুষ, ত্যাগবৈরাগ্যময় সাধুসমাজ—এসব মিলিয়েই স্বামীজীর কাছে ছিল সমগ্র ভারত। পলাশীর যুদ্ধে নবাবের শোচনীয় পরাজয় ছোট থেকেই তাঁর সংবেদনশীল মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলত; মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি তা ব্যক্ত করতেন। স্বদেশ ও স্বজাতির কষ্ট, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, নিজ ধর্মসম্বন্ধে তাদের গভীর অজ্ঞতা আর তারই ফলে সামাজিক কুসংস্কার, সংকীর্ণতা, তার সঙ্গে বিদেশিদের অধীনতা—এসবের ফলে তীব্র মানসিক যন্ত্রণা তাঁকে যেন ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল শিকাগো ধর্মমহাসভায়, যেখানে উন্মুক্ত মঞ্চে জগতের সবদেশের জ্ঞানীগুণীরা উপস্থিত, যাঁদের কাছে তিনি তুলে ধরবেন ভারতের মহিমার চিত্রখানি গভীর প্রজ্ঞায় সুচিন্তিত ভাষণে—অসীম মনোবল ও দৃঢ়তা সহকারে, সেই সঙ্গে ভারতকে যোগ্য মর্যাদাদানের জন্য বিদেশি ও স্বদেশিদেরও মানসিক ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করে দেবেন।

স্বামীজী বুঝেছিলেন ভারতের বৃহত্তর জনসাধারণের উন্নতির উপায় না ভেবে, তাদের জাগরণ না ঘটিয়ে, অপ্রস্তুত অবস্থায় ভারত যদি ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি চায়, তবে তা ভিক্ষুর দয়াভিক্ষার মতনই হবে এবং তা বিশ্ববাসীর সমর্থন পাবে না। রাজনৈতিক মুক্তিকামী যে-কোনও দেশেরই চাই জনসমর্থন তার পক্ষে যে, সে

স্বাধীনতালাভের যোগ্য। স্বামীজীর এই ভাবনাটি যে যথেষ্ট ফলদায়ী হয়েছিল ওই মহাসভার প্রেক্ষিতে, ইতিহাসই তার সাক্ষ্য বহন করছে। ১৮৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল, ''Swami Vivekananda has done much more to elevate our nation (towards freedom) to the estimation of the people of the West than what has hitherto been done by all our political national leaders together.'' স্বদেশি আন্দোলনকারীদের মধ্যে অন্যতম মনোরঞ্জন গুহ বলেছেন, "Vivekananda's speech in Chicago would provide much incentive to the Indian national movement." প্রখ্যাত বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়, তাঁর 'India in Transition' গ্রন্থে লিখেছেন, ''বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পাল বিপ্লবাত্মক স্বাদেশিকতার প্রবর্তন করেছিলেন ঠিকই কিন্তু স্বামীজীর আধ্যাত্মিক স্বদেশভাবনাই ছিল তার প্রকৃত উৎস, যা তাঁর শিকাগো ভাষণেই প্রথম প্রকাশ পায়, যা বিদেশের মাটিতে এবং স্বদেশের স্বাধীনতাকামী ছেলেদের অন্তরে তীব্র স্বদেশপ্রেমের তরঙ্গ খেলিয়ে তাদের আন্দোলনকে আরও জোরদার করে তোলে।''

শিকাগো মহাসভায় স্বামীজীর যোগদানের আট বছর আগেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়েছিল। স্বামীজী এ-খবর জানতেন, কিন্তু তিনি খুব আশাবাদী ছিলেন না। কারণ তিনি লক্ষ করেছিলেন, কিছু রাজন্যবর্গ ও ইংরেজদের অনুগৃহীত ধনী কিছু শিক্ষিত মানুষ এর সদস্যপদ পেয়েছে এবং ইংরেজদের কাছ থেকে কিছু প্রশাসনিক অধিকার অর্জন করে নিজেদের পদমর্যাদা অনুযায়ী খেতাবধারী হতে চেয়েছে। ভারতের শাসক তখন ইংরেজশক্তি—তাদের রূপ, গুণ, স্বাধীন চালচলন এদেশের শিক্ষিতদেরও যেন hypnotise করে ফেলেছিল। তারা ইংরেজদের সঙ্গে সমসুরেই ভারতের ধর্ম, সমাজব্যবস্থা, জীবনযাত্রার অপব্যাখ্যার দ্বারা মাতৃভূমিকে হীন প্রতিপন্ন করে শাসকশ্রেণির বাহবা লাভ করেছিল এবং সমাজে উচ্চ সম্মানের স্থান দখল করে জনগণের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছিল। কিন্তু ১৮৯৩ সালে স্বামীজীর শিকাগো ভাষণের পরপরই এই শ্রেণির মানুষদের ব্যবহারে ও কথায় কিছু পরিবর্তন দেখা গেল। ইংরেজ তোষণের ক্ষেত্রে কিছু সংযম দেখা দিল। ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৭ সালের মধ্যেই লক্ষণীয় পরিবর্তন হল—ইংরেজদের স্তুতি করে দাবিদাওয়া আদায় করা থেকে কংগ্রেস বিরত হল এবং জাতীয় কংগ্রেসের নেতা বালগঙ্গাধর তিলক প্রায় স্বামীজীর ভাষাতেই বলে উঠলেন, "Freedom is our birthright"। এতদিনে স্বায়ত্তশাসনের আবেদন থেকে সরে এসে দেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষিত হল। এবং ঠিক এইসময় থেকেই তিলক তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় 'Militant Nationalism'-এর পক্ষপাতী হয়ে সওয়াল শুরু করেন, যার মধ্য দিয়ে নিশ্চিতভাবেই স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বরই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। সুতরাং বলা যেতে পারে শিকাগো সভাতেই স্বামীজী স্বাধীন ভারতের জন্য যে-দুন্দুভিনিনাদ করেছিলেন, সেই স্বরতরঙ্গই আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীকে আত্মবিশ্বাসে জাগরিত করে স্বাধিকার অর্জনে তাদের যোগ্য প্রস্তুতি নিতে ও জয়যাত্রায় উন্নতশির হয়ে এগিয়ে যেতে অমিত শক্তি সঞ্চার করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন একটি চিরকুটে লিখেছিলেন, ''নরেন শিক্ষে দিবে যখন ঘুরে বাহিরে হাঁক দিবে।'' এখানে শব্দপ্রয়োগটি লক্ষণীয়। 'ঘুরে' শব্দটি ভারতভ্রমণ বোঝাচ্ছে। আবার 'ঘুরে'-কে যদি 'ঘরে' ধরি তাহলেও দেশের মধ্যে বোঝাবে। 'বাহিরে' অবশ্যই ভারতের বহির্দেশে। 'শিক্ষে দিবে' অবশ্যই জ্ঞানচেতনা দেওয়া অর্থে

প্রযুক্ত হয়েছে। 'হাঁক দিবে' অর্থাৎ শুধু 'বলা' নয়, 'হাঁক পাড়া' অর্থাৎ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দ্বারা সকলকে সচেতন করাই বোঝায়—যে-কাজটি তিনি শিকাগোর মঞ্চে দাঁড়িয়ে করেছিলেন। আশ্চর্যভাবে স্বামীজীর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রধানতম কর্মটিকে শ্রীরামকৃষ্ণ কী অসাধারণ দক্ষতায় একটিমাত্র বাক্যে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন! স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর যে-'বিবেকরূপ অস্ত্র' দিয়ে এই কর্মটি করেছেন, তা দুটি তীক্ষ্ণ ফলাযুক্ত ছিল—একটি দিয়ে বিদেশিদের, অন্যটি দিয়ে স্বদেশিদের বিদ্ধ করে তাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করে দিয়েছিলেন তিনি। আচার্যের কাজটি তো তাই—'জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া' তিনি 'অজ্ঞানতিমিরান্ধ' মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে দেন। স্বামীজী এই অর্থে সেদিন থেকেই 'বিশ্বাচার্যের' ভূমিকায় অধিষ্ঠিত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর দিব্যশক্তিবলে নরেন্দ্রের মধ্যে যে-অসীম সম্ভাবনাময় প্রবল তেজ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই ভস্মাচ্ছাদিত প্রাণবহ্নিকে জাগ্রত করে বিদেশের মঞ্চে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন 'জগন্মাতার' কাজ করবার জন্য। শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রমুখ সশস্ত্র বিপ্লববাদে বিশ্বাসীরা দেশকে মাতা বলেই সম্বোধন করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভবানীমন্দিরে' দেশমাতৃকাই উপাস্য ছিলেন। স্বামীজী লিখেছেন, ''তোমার সমাজ (দেশও বটে) সেই বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র'', সুতরাং রামকৃষ্ণদেব কথিত 'জগন্মাতা' ও 'দেশমাতা'য় কোনও প্রভেদ করা যাবে না। জগন্মাতার কাজ দেশমাতৃকার জন্য কাজকেও বোঝাবে। স্বামীজীর সেই 'হাঁকপাড়া' প্রতিবাদী গর্জন, দু-চারটি বিধ্বংসী বোমার থেকেও ছিল বেশি effective। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় শিকাগো ভাষণেই স্বামীজী ভারতের বিজয়ভেরী বাজিয়ে দিয়েছিলেন; পাশ্চাত্যের বস্তুবাদ, হিংস্রতা, লোভ ও দমননীতির বিরুদ্ধে ঘোষিত হল এই প্রথম ভারতের অধ্যাত্মশক্তির বিজয়, আর সেদিনই তার স্বাধীনতালাভের পথও যেন তৈরি হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ কি সেই দিনটির স্মরণেই লিখেছিলেন, ''ওরে তুই ওঠ আজি, আগুন লেগেছে কোথা,/ কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি, জাগাতে জগতজনে?'' রোম্যাঁ রোল্যাঁ স্বামীজীর ওই ভাষণ প্রসঙ্গেই লিখেছেন—যেন লেলিহান বহ্নিশিখা, তা যেন সমবেত শ্রোতার আত্মায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। পরবর্তী কালে ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামীদের স্বাধীনতালাভের জন্য যে-মৃত্যুঞ্জয়ী সাহস, বীরত্ব, ত্যাগ ও দেশপ্রেমের বহ্নিশিখা লেলিহান হয়ে উঠেছিল, তার উৎসমুখ বিবেকানন্দ-বহ্নি বললে কিছুমাত্র ভুল হবে না। স্বামীজী নিজেও তাই-ই চেয়েছিলেন : ''আমার মধ্যে যে আগুন জ্বলছে, তা তোমাদের ভেতর জ্বলে উঠুক।''

নিবোধত কার্যালয়ের ছুটির বিজ্ঞপ্তি

৬ নভেম্বর ২০১৮ কালীপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বিকেলে বন্ধ থাকবে।
১৭ ও ১৮ নভেম্বর ২০১৮ জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় দুদিন বন্ধ থাকবে।